বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন

নাসিরুদ্দিন চৌধুরী

আজ ২৬ মার্চ, আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণায় তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বসে যখন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির উদ্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা লিখছেন, তখন পাকিস্তানি কমান্ডোরা তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ৩২নং বাসভবন ঘেরাও করে বৃত্ত ছোট করে আনছে। তিনি তখন জাগতিক ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত নিঃশঙ্ক একজন মানুষ। জাতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন তিনি। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একে একে সকল সহকর্মীকে বিদায় দিয়ে ৩২ নম্বরে একাই তিনি অপেক্ষা করছেন। কোন কোন সহকর্মী তাঁকে নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করার কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আমি স্বাধীনতা দিয়েছি, যাও সেটাকে রক্ষা করো"।

বঙ্গবন্ধু জানেন তাঁকে না পেলে পাকিস্তানি হায়েনারা বাংলাদেশের মাটি খুঁড়ে তাঁর লাশ খুঁজে দেখবে। স্বাধীনতার ঘোষণা তৈরির পর এবার সমস্যায় পড়লেন কিভাবে সেটি বাইরে অপেক্ষমান বলীয় নেতা-কর্মী এবং দেশবাসীর কাছে পৌঁছানো যায়। এই ঘোষণা প্রচারের কথা ভাবতে ভারতে তাঁর মনে পড়লো চট্টগ্রামে তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সংসদ সদস্য জহুর আহমদ চৌধুরী আছেন–তাঁকেই ঘোষণা প্রচারের গুরুদায়িত্ব দেয়া যায়। তাঁর বাড়ির নিকটতম এক প্রতিবেশিকে ডেকে বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্রটি চিরকুট আকারে লিখে হস্তান্তর করলেন। তাঁকে জহুর আহমদ চৌধুরীর টেলিফোন নম্বর দিয়ে সেই নম্বরে মেসেজটি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রত্যেক বাঙালি তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিলো। সেই প্রতিবেশি বঙ্গবন্ধু মেসেজটি চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর বাড়িতে ফোন করে দিয়েছিলেন। পরেই অনেক নাটকীয়তাপূর্ণ সেই ভয়ংকর ফেইটফুটল রাত, যা তখন ক্ষণিকের জন্য থমকে ছিলো একটু পরেই তা যখন পাকিস্তানি জানোয়ার, বাহিনী পৃথিবীর নিকৃষ্টতম, ভয়াবহতম, নিষ্ঠুরতম গণহত্যার মিশন নিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে বাঙালি জাতির ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, এই দিনটি আমাদের অনেকদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্ত; যেদিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার কথা তিনি সাতই মার্চও রেসকোর্সের জনসভায় বলেছিলেন; কিন্তু সেদিন তিনি 'আজ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র'– সরাসরি একথাটা বলেন নি; সেটি বললেন ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাটি হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজাবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ–দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।

জয় বাংলা
শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১

ঘোষণাটা ইংরেজিতে ছিলো; জহুর আহমদ চৌধুরীর পারিবারিক সংগ্রহশালায় সেটি সংরক্ষিত আছে। ইংরেজি ঘোষণাটি নিম্নে দেয়া হলো:

"Pak Army suddely attacked E.P.R. Base at Pillkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens; street battles are going on in every street of Dacca. Chittagong. I appeal to the Nations of the World for help. Our freedom-fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask E.P.R., Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight No compromise; Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland Convey this message to all Awami League leaders.Workers and other patriots and lover of freedom. May Allah bless you?"
"Joy BANGLA"
Sk. Mujibur Rahman.

জনাব মোশাররফ হোসেন বঙ্গবন্ধুর মেসেজটি দেয়ার জন্য রাত সাড়ে এগারটায় জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসার টেলিফোনে (নং ৮০৭৮৫) কল করেন। জহুর আহমদ চৌধুরী বাসায় ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী ডা. নুরুন্নাহার জহুর তা' লিখে নেন। নুরুন্নাহার জহুর মেসেজটি লিখে নেয়ার পর জহুর আহমদ চৌধুরীকে জানালে তিনি ত্বরিৎ তৎপরতায় মেসেজের সাইক্লোস্টাইল কপি করে সারা শহরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। মাইক দিয়ে প্রচারের জন্য রিক্সা, ঠেলাগাড়ি ও ট্যাক্সি নুরুন্নাহার জহুর তাঁর স্বামীর নির্দেশে মেসেজটি অয়ারলেসের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে প্রেরণের জন্য সীতাকুণ্ড থানার সলিমপুর অয়ালেস স্টেশনে পাঠান। সীতাকুণ্ড থানার সলিমপুর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অয়ারলেস স্টেশনের তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী এ.কে.এস.এম.এ হাকিম তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বহির্বিশ্বে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের জন্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা বেতার মাধ্যমে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছাপিয়ে ও সাইক্লোস্টাইল করে প্রচারের পাশাপাশি তাঁরা চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিশন সেন্টার চালু করেন। যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামকরণ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণার স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুরুদ্ধ হয়ে সেখানে অবস্থিত অস্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমানও ২৭ মার্চ চান্দগাঁও ট্রান্সমিটার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন, যা ২৯ মার্চ তারিখে পুনঃপ্রচারিত হয়।

মগবাজার ভিএইচএফ অয়ারলেস স্টেশন থেকেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার একটি বাণী চট্টগ্রামের সলিমপুর অয়ারলেস (ভিএইচএফ) স্টেশনে ভোর ৪টা বা ৫টার মধ্যে এসে পৌঁছেছিলো। ইপিআর-এর অয়ারলেসযোগে ঐ বার্তা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি থানায় এবং ইপিআর পোস্টে পৌঁছে যায় এবং তা' সর্বত্র সাইক্লোস্টাইল করে বিতরণ করা হয়। বিদেশের পত্র পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, পাকিস্তান থেকে পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও গৃহযুদ্ধের খবর প্রচারিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে দূরতম সম্বন্ধ এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের নিকটতম সম্পর্ক নির্ণয় করা দুষ্কর নয়। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সম্বন্ধটা প্রত্যক্ষ।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সকাল নয়টায় ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পূর্বাহুত অধিবেশন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে পয়লা মার্চ বেলা ১টা ৫ মিনিটে একটায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিন আওয়ামী লীগের পূর্বঘোষিত কোনো কর্মসূচি না থাকলেও চাপা উত্তেজনা ছিলো, উত্তাপ ছিলো দেশজুড়ে। ইয়াহিয়ার অপ্রত্যাশিত ঘোষণা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিলো। প্রতিবাদ জানাতে গোটা জাতি রাস্তায় নেমে আসে। সরকারি কর্মচারীরা সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য সরকারি অফিস থেকে বের হয়ে পড়লেন, ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলোও খালি হয়ে গেল। স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিলো। ইয়াহিয়ার বেতার ঘোষণা শোনামাত্র দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসতে লাগলো কেউ কাউকে ডাকার প্রয়োজন পড়েনি; তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মানুষ- লাঠিসোটা হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে মিছিলে সামিল হয়েছে; সে মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে বাংলাদেশ পরিব্যাপ্ত করে ফেলে।

তখনো বাংলাদেশ হয়নি; কিন্তু বাঙালির ঐক্যবদ্ধ বজ্রনির্ঘোষে পূর্ব পাকিস্তান সেই একটি দিনে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সেদিনই শুরু হয়। "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ", "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "সব কথার শেষ কথা- বাংলা স্বাধীনতা", "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর", "তোমার নেতা আমার নেতা- শেখ মুজিব শেখ মুজিব" ইত্যাদি স্লোগান শত সহস্র জনতার স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিতে হতে থাকে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব হয়ে যায় বাংলাদেশ। উদ্দীপ্ত অভূতপূর্ব সে গণজাগরণ-স্বাধীনতার চেতনায় শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবা, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ইত্যাদি সর্বস্তরের নারী-পুরুষ ঘর ছেড়ে রাজপথের মিছিলে সামিল হয়েছিলেন।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একপ্রকার চুপ হয়ে বসে ছিলেন। এমনি অবস্থায় আওয়ামী লীগ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে সোচ্চার হলে প্রেসিডেন্ট ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন ৬ দফার ব্যাপারে কোন সমঝোতার সম্ভাবনা না থাকায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ঢাকার অধিবেশনে যোগদান করবে না। তবে ৬ দফার রদবদলে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হলে ঢাকায় যেতে পিপিপির কোন আপত্তি নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে বালুচ নেতা নবাব আকবর খান বুগতি ১৭ ফেব্রুয়ারি বলেন, "অধিবেশন বানচাল করতে জনাব ভুট্টো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা পাকিস্তানের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশে নেয়া হয়েছে"। বঙ্গবন্ধু প্রতিক্রিয়া জানান ২৪ ফেব্রুয়ারি; তিনি বলেন, "জনসাধারণের নির্বাচনী বিজয় বানচাল করার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনসাধারণের সতর্ক ও সজাগ হওয়া দরকার।" এদিকে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুমপন্থি মুসলিম লীগও

পিপিপির সাথে সুর মিলিয়ে ঢাকায় আসতে অস্বীকার করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৩ জন ঢাকায় অধিবেশনে যোগ দেবেন বলে ঘোষণা দেন।

৩ মার্চের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য তারা ঢাকা আসা শুরু করেন। কিন্তু নির্বাচনের পরে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক পরিবেশ তখনই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন ইয়াহিয়া ১ মার্চ দুপুর ১:০৫ মিনিটে এক বার্তায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই ইয়াহিয়া পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়; মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

অসহযোগ আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট অর্জন হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত- 'স্বাধীনতা'; বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন সেদিন ওই একটি শব্দের বজ্রনির্ঘোষে মুক্তি পেয়েছিলো। স্বাধীনতা তখন আর কোনো 'স্বপ্ন' নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতা; নিষিদ্ধ বর্ণমালা নয়, বরং এক স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীনতার ওপর জনগণের অধিকার এবং রাষ্ট্রের ওপর বাঙালি জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হলো। জনগণের সেই অধিকার হরণ এবং জনগণের কায়েম করা স্বাধীন রাষ্ট্রকে পুনঃদখল করার জন্য পঁচিশে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হায়েনা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশের বুকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের সাত মার্চ রেসকোর্সের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়ার পর থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নটি বাঙালি জাতির সামনে চলে আসে। তার আগে থেকে তাঁরই ডাকে অসহযোগ আন্দোলন চলে আসছিলো।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশ-এর জন্ম হয়; অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন ছিলো মুক্তিযুদ্ধের মুখবন্ধ; এই সময়টাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাতির মানসিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাল বলা যেতে পারে। এই সময়ের আন্দোলনের আগুনে পুড়ে বাঙালি 'সামরিক জাতি'তে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্‌যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় সারাদেশে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসামরিক জনগণের সামরিক শিক্ষায় কাঠের ডামি রাইফেল বানিয়ে অস্ত্রের অভাব পূরণ করা হয়েছিলো। এই শিক্ষা যুদ্ধের ময়দানে কতটুকু কার্যকরী হয়েছিলো সেটা নয়, বড় কথা হচ্ছে ওই অস্ত্র শিক্ষার মধ্যে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধস্পৃহাই প্রতিফলিত হয়েছিলো। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়-শহরে-গ্রামে, প্রকাশ্যে উন্মুক্ত মাঠে ময়দানে, ধান কাটা সারা বিলে গড়ে ওঠা অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টারে তখন দিন-রাত ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষকের লেফ্‌ট রাইট, কুইক মার্চ রণধ্বনি-বাংলার চেনা দৃশ্যে পরিণত হয়েছিলো। সামরিক শিক্ষার এমন সর্বব্যাপী বিপুল উৎসাহ যা তখন বাঙালি জীবনে দেখা গিয়েছিলো; আর কোনো জাতির জীবনে তেমনটা ঘটেছিলো কিনা আমাদের জানা নেই।

এই বিপুল সোৎসাহ সামরিক প্রশিক্ষণকে জনযুদ্ধ বা জনগণের যুদ্ধের প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। সেই সময় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ধারায় স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সাধারণ মানুষের সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো। প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ান এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরাই অবসর জীবনের অবসান ঘটিয়ে জনগণকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাও যুদ্ধের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ শুরু হলে তারা যোগদান করেছিলেন। এই গণপ্রস্তুতির পাশাপাশি পাকিস্তান সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গেও কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়- যাতে সময়ে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁরা পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে পারেন।

পাকিস্তানের সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিলো; ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতির বিভিন্নতাকে শুধুমাত্র ধর্মের রজ্জুতে বাঁধা ওই গেরোর মধ্যেই 'ফস্কা' ছিলো এবং একাত্তরে যে ছিঁড়ে গেলো সেটাই ছিলো তার অনিবার্য নিয়তি। এই সৃষ্টি ও ধ্বংসে কত অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে গেল, কত নারী বিধবা হলো ও সম্ভ্রম হারালো, কত পিতা-মাতা সন্তানহারা হলো, কত শিশু পিতৃমাতৃহারা হলো–তার কোনো লেখাঝোকা নেই। পাকিস্তান সৃষ্টিতে রক্তের বন্যায় ভাসলো উপমহাদেশ; তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে ত্রিশ লাখ বাঙালির প্রাণবলিদানের প্রয়োজন হলো; রক্তে লাল হয়ে গেলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, আড়িয়াল খাঁ, কীর্তনখোলা, মধুমতি, গোমতী, কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুহুরী, বাকখালীর পানি। দু'লাখ মা বোনের মান গেলো, কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে প্রতিবেশি বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিলো।

বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হিংস্র, বর্বর পশ্চিমা সৈন্যদের হত্যা ও ধ্বংসের অবাধ লাইসেন্স দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছিলো নিদ্রিত বা নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত বাংলাদেশের নিরীহ বেসামরিক জনগণের ওপর; সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈনিক ও পুলিশও রেহাই পেলো না তাদের প্রতিহিংসার কবল থেকে। ট্যাংক-কামান, রকেট, রিকয়েললেস রাইফেল, মেশিনগান নিয়ে হামলা চালিয়ে প্রথম চোটেই তারা ধুলায় মিশিয়ে দিলো আন্দোলনের দুর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ইপিআর সদর দপ্তর। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ইয়াহিয়ার গণহত্যার নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য পাঞ্জাবি সৈন্যরা অন্তহীন নিষ্ঠুর, নির্মম নরহত্যা, পাশবিক অত্যাচার, বেপরোয়া লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা নয়মাস

ধরেই চালিয়ে যায় এবং বস্তি, ছাত্রাবাস, শহর-বন্দর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশানে পরিণত করে সোনার বাংলাদেশকে। অপরিমেয়তায়, ভয়াবহতায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞের কোনো তুলনা মানবজাতির সভ্য ইতিহাসে মেলে না।

অতঃপর বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ যথাক্রমে প্রবাসী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণা প্রণয়ন করেন, যা' পরবর্তকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রূপ পরিগ্রহ করে। নয়মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে।

#

পিআইডি ফিচার